বালাকোট
BALAKOT MEDIA
" এসো, এই
বিজয়ের
পথের পথিক হই
এসো, আর
পেছনে না
বসে থাকি"
- ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি (রহ)
কেন তারা ইমাম আওলাকিকে
টার্গেট করেছে!

কেন তারা ইমাম আওলাকিকে টার্গেট করেছে!

বালাকোট মিডিয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ফোর্ট হুড হামলার পর মুসলিম কমিউনিটি এবং অমুসলিমদের মাঝে ইমাম আনওয়ার আল আওলাকিকে নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে । ইমাম আওলাকির ব্যাপারে বেশ কিছু মুসলিম দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গেছে। ৫ নভেম্বর, ২০০৯ এর হামলার আগেও যারা তাকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতো, এই ঘটনার পর তাদের অনেকের কাছে ইমাম আনওয়ার এখন প্রশ্নবিদ্ধ একটি চরিত্র, তার দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক অবস্থানের সাথে তারা কতোটুকু একমত হবে -- এ ব্যাপারে তারা সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আমেরিকান মিডিয়া তাকে নিয়া সমালোচনা শুরুর পরপর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মুসলিম ব্লগাররা ফোর্ট হুড ঘটনার নিন্দার ঝড় বইয়ে দিয়েছে এবং এমনকি কেউ কেউ ইমাম আনওয়ারকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিয়েছে! আমি মনে করি এই ব্যাপারগুলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ করার দাবি রাখে -- এই ধরণের হামলার ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? ইমাম আওলাকি কি একজন মুসলিম? নাকি তার বিরোধিরা মুনাফিক্ব?

এই ঘটনা ও ঘটনা-পররবর্তী প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা আগে ইমাম আনওয়ার আল আওলাকি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য জেনে নিই।

কে ছিলেন ইমাম আওলাকি?

ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকির জন্ম আমেরিকায়, এক ইয়েমেনি পরিবারে। তার বাবা নাসের আল-আওলাকি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৮ সালে তারা ইয়েমেনে ফিরে যান, সেখানেই ইমাম আনওয়ার দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকেন। এরপর তিনি ১৯৯১ সালে আমেরিকার কলোরাডোতে ফিরে আসেন কলেজে পড়াশোনা করতে। তিনি কলোরাডো স্টেইট ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স পাস করেন এবং সানডিয়েগো স্টেইট ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশন লিডারশিপের উপর মাস্টার্স করেন।

১৯৯৪ থেকে '৯৬ পর্যন্ত তিনি ডেনভার ইসলামিক সোসাইটিতে ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন

করেন। এরপর চলে যান সানডিয়েগোর মাসজিদ আর-রিবাত আল-ইসলামীতে, সেখানে তিনি ২০০০ সাল পর্যন্ত থাকেন।

তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন তার কিছু অডিও লেকচারের মাধ্যমে, জ্ঞানগর্ভ ও তথ্যবহুল তার এই লেকচারগুলোর বিষয়বস্তু ছিল ইসলামের ইতিহাস এবং রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সীরাহ এর ওপরে। জিহাদের উপরেও তিনি বেশ কিছু লেকচার দেন, বরাবরের মতো সেগুলোও ছিল কুরআন ও রাসূলুলুল্লাহর (সা.) সুন্নাহ ভিত্তিক।

অনেকেই তার ইসলামী জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এর উত্তরে বলতে হয়, তিনি একাধিক আলিমের কাছেই ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে কুরআন, কুরআন শাস্ত্র, হাদীস, হাদীস শাস্ত্র, তাফসীর, ফিক্বহ, উসুল আল ফিক্বহ অধ্যয়ন করেছেন এবং এ সব বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যাপারে ইজাযাহ (স্বীকৃতি) পেয়েছেন। তিনি যাদের কাছে দ্বীনের ইলম লাভ করেছেন তারা হলেন,

- **শাইখ হাসসান মাক্ববুলি আল আহদাল**
- **শাইখ হুসেইন বিন মাহফুয**
- **শাইখ আবদুল রাহমান শুমাইলাহ আল আহদাল**
- **শাইখ হামুদ শুমাইলাহ আল আহদাল**

ইমাম আওলাকি ছিলেন নিঃসন্দেহে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, কুরআন ও সুন্নাহর দলিল ছাড়া তিনি কথা বলতেন না।

সমালোচনার তীর

ইমাম আওলাকিকে নিয়ে ছড়ানো মিডিয়া প্রোপাগান্ডার আলোচনায় যাবার আগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটি আয়াত না জেনে নিলেই নয়:

"হে নবী, আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ১)

অর্থাৎ কাফির ও মুনাফিক্ব -- এই দুই গোষ্ঠীকে সহজে বিশ্বাস করা যাবে না। ইমাম আনওয়ারের বিরুদ্ধে যত সমালোচনা সেগুলোর কারণ আর কিছুই নয়, ইসলাম। ইসলামের মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়গুলোর ব্যাপারে তার অনড় অবস্থানের কারণেই তার প্রতি মিডিয়ার যত ক্ষোভ, এ কারণেই তাকে বলা হয় 'মৌলবাদী।' তার সমালোচনা করা হয় কারণ তিনি ছিলেন মুসলিম বিশ্বে মুরতাদদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তাকে ঘৃণা করা হয় কারণ তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নাযিল করেছেন তা ছাড়া অন্য কিছুই মানতে ছিলেন নারাজ। তার নিন্দা করা হয় কারণ তিনি ফোর্ট হুডের সৈনিক মেজর নিদাল হাসানকে তার অপারেশনে আদর্শিক প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমেরিকান মিডিয়ার কথায় বিশ্বাস করে যে মুনাফিক্বরা ইমাম আনওয়ারকে ঘৃণা করে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"আপনি কাফের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনিবার্হীরূপে যথেষ্ট।" (সূরা আহযাব, ৩৩: ৪৮)

মুনাফিক্ব ও কাফিরদের গা-জ্বালা দেখে আমাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা তাদের দাবির মাঝে কোনো সত্যতা নেই। মুনাফিক্বদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের পরিস্কারভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং আমাদের উচিত সে সতর্কতা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা। সুখের বিষয় হল মুনাফিক্বদের চেনা কঠিন কোনো কাজ নয়।

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো -- যা তিনি রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।" (সূরা নিসা, ৪: ৬১)

যখন আমরা বলি, আল্লাহর আদেশ এবং রাসূলুল্লাহর (সা.) আমাদের মেনে চলতে হবে, তখন তারা আমাদেরকে মৌলবাদী আর চরমপন্থী আখ্যা দেয় আর নিজেরা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

এগুলো হল মুনাফিক্বদের কিছু বৈশিষ্ট্য যা কুরআনে উল্লেখ আছে। কাজেই মুনাফিক্ব এবং কাফিরদের কথা বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমি মুনাফিক্ব বলতে এখানে তাদেরকে বোঝাচ্ছি যারা নিজেদের মুসলিম হিসেবে দাবি করে কিন্তু এমন নীতিতে বিশ্বাস করে যা কুরআন এবং রাসূলুল্লাহর (সা.) আনীত সুন্নাহর পরিপন্থী।

ফোর্ট হুডের ঘটনা

ফোর্ট হুডের সামরিক ক্যাম্পে ১৩ আমেরিকান সৈনিককে হত্যাকারী মেজর নিদাল হাসানের অপারেশন নিয়ে অনেক কথাই বলার আছে, তবে এ ব্যাপারে আমি খুব বেশি খুঁটিনাটি আলোচনায় যেতে চাই না। শুধু কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত, ১২ বছর আগে নিদাল হাসান কী করেছিলেন, ফোর্ট হুডের আলোচনায় সেটি প্রাসঙ্গিক কিছু না। যেসব মুসলিম দাবি করছে, মেজর নিদাল হাসান আমেরিকান সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার কারণে আগেই কাফির হয়ে গেছে, তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা। ইসলামের ইতিহাসে তিনি ছিলেন সেরা নেতাদের একজন, অথচ এই তিনিই রাসূলুল্লাহকে (সা.) একদিন হত্যা করতে চেয়েছিলেন, সেটি ছিল তার ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। কিন্তু এই কাজ দিয়ে আমরা উমরকে (রা.) এখন বিচার করতে পারি না, সেটি ছিল তার অতীত। এমন হতে পারে যে একজন মানুষ হয়তো জীবনভর শুধু গুনাহই করেছে, কিন্তু অসীম দয়াময় আল্লাহ যদি চান তাকে পথ দেখাবেন, তখন সে মৃত্যুর খানিক আগে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে এসেছে। অন্যদিকে এমন দৃষ্টান্তও আছে যে একজন মানুষ সারাজীবন ভালো

মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় তার সবগুলো কাজই ঠিক। আর এই কারনেই আমাদের উচিত যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) শরণাপন্ন হওয়া।

ঘটনাটি ঘটেছিল ফোর্ট হুডে, সংখ্যার দিক থেকে আমেরিকার সবচেয়ে বড় মিলিটারি বেইস। এই বেইস থেকেই আফগানিস্তান এবং ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" এর নামে আমেরিকা কী করছে সে সম্পর্কে কিছু মুসলিম হয়তো বিস্তারিত নাও জানতে পারে, তবে একথা কারো অজানা নয় আমেরিকা ও তার মৈত্ররা মুসলিম বিশ্বে প্রতিনিয়ত মুসলিমদের হত্যা করে চলেছে। আফগানিস্তানে আর ইরাকে যারা আমেরিকার হাতে খুন হচ্ছে তারা কেউই ক্রিমিনাল নয়, তারা মুসলিম নারী, পুরুষ আর শিশু। আবু ঘারিবের গোপন কারাগারে আমেরিকা কী নৃশংস জঘন্য কাজ করেছে তা আজ আর কারো অজানা নয়। অজানা নয় তাদের ইরাকে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ আর মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ ধ্বংসের কাহিনি। মুসলিমরা আজ তাদের হাতে সর্বাত্মকভাবে আক্রান্ত। অনেকে হয়তো মনে করতে পারে আমেরিকা "নিছক তেল এর জন্য" যুদ্ধ করছে কিংবা তাদের কাছে "এটি কোনো ধর্মীয় যুদ্ধ নয়" -- কিন্তু কেউ যদি ভালো করে লক্ষ্য করে তাহলে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে এই যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মের জন্য যুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।" (সূরা বাক্বারা, ২: ১২০)

এই আয়াতটি ইহুদি বা খ্রিস্টানদের কোনো বিশেষ দলের কথা বলছে না, বরং বলছে তারা আমাদেরকে ব্যাপারে কখনই সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না আমরা তাদের পথ অনুসরণ করি। আমরা তাদের সাথে যত শান্তিচুক্তিই করি না কেন, তারা সবসময়ই চাইবে যেন আল্লাহর পথ থেকে

আমাদের দূরে সরিয়ে রাখা যায়।

ব্যাপারটা এমন নয় যে তার দেশে সরাসরি হামলা করলেই সে কেবল প্রতিহত করবে -- না, ব্যাপারটি এমন নয়, ইসলামে জাতীয়তাবাদের কোনো স্থান নেই, দেশভিত্তিক, নামভিত্তিক ভালোবাসার কোনো স্বীকৃতি ইসলামে নেই। আমরা সকলে মুসলিম, পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের মুসলিমদের উপর হামলা মানে সমগ্র মুসলিমদের উপর হামলা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের থিংকট্যাংক এবং তাদের নীতিনির্ধারকরা এখন প্রকাশ্যে স্বীকার করছে যে তাদের যুদ্ধ ইসলামের আদর্শের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যে আদর্শ আল্লাহর শাসন চায়, সে আদর্শকে তারা মেনে নেবে না। পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার জন্য একজন মুসলিমের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট।

মুসলিমরা যুদ্ধরত অবস্থায় আছে এতটুকু প্রমাণ হবার পর আমাদের ওপর সেই হুকুমই কার্যকর হবে যে হুকুম আল্লাহ রাসূল (সা.) সেই সময়ের আক্রান্ত মুসলিমদের উপর কার্যকর করেছিলেন। তিনি কি পাবলিক ফোরামে দাঁড়িয়ে বিতর্ক করেছেন আর সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন? নাকি তিনি হিজরত করেছিলেন আর জিহাদ করেছিলেন? তিনি কি জিহাদ না করে শুধু দাওয়াতী কার্যক্রমের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন? তিনি কি মক্কার সরকারের প্রবল বিরোধিতা করেন নি? তিনি কি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন নি যখন তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করেছিল? তিনি কি কুরাইশদের মিত্রদের সাথে যুদ্ধ করেন নি? আমরা যদি বুঝতে চাই ইসলামে কোন কোন কাজগুলোর অনুমতি আছে আর কোনগুলোর নেই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সা.) সময়কার যুদ্ধের স্ট্র্যাটেজিগুলো বুঝতে হবে।

কোনো কোনো মুসলিম বলে আমেরিকা তো মুসলিম দেশগুলোর সাথে শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ আছে, আর যাদের সাথে শান্তিচুক্তি আছে তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের অনুমতি দেন নি। তারা কি জানে না কেউ যখন শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে তখন আমাদের কী করণীয়?

“আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়।” (সূরা তাওবা, ৯: ১২)

আমরা যদি রাসূলুল্লাহর (সা.) জীবনের দিকে তাকাই আমরা দেখবো আমরা আদিষ্ট হয়েছি জুলুম, অত্যাচার এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। কুরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে বলা হয়েছে আমরা শুধু নিজেদের দেশ আর এলাকাকে প্রতিরক্ষা করে ক্ষান্ত হবো আর বিশ্বের বাকি মুসলিমদের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে যাবো। যখন শেষ বিচারের দিনে আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে -- তুমি তোমার অসহায় ভাই-বোনদের জন্যে কী করেছ? -- তখন আপনি কী উত্তর দিবেন?

“আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী।” (সূরা নিসা, ৪: ৭৫)

এই প্রশ্নের কোনো উত্তর কি আমাদের জানা আছে?

ফোর্ট হুড অপারেশন

- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর তার মিত্রবাহিনি ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারা তাদের সামরিক শক্তি আর অর্থসম্পদ দেদারসে ব্যয় করছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

- ফোর্ট হুড হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মিলিটারি বেইস।

- ফোর্ট হুডের যে সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে তাদেরকে আগে-পরে আফঘানিস্তান বা ইরাকেই প্রেরণ করা হত।

যুদ্ধাবস্থায় যে কেউ তার শত্রুদের উপর হামলা চালাতে পারে -- এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, শত্রুর উপর কি তার দেশে মিলিটারি বেইসে হামলা চালানো যেতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলছেন,

"আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মাসজিদুল হারামের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান।" (সূরা বাক্বারা, ২: ১৯১)

কেউ যদি মনে করে এই আয়াতে শুধু রাসূলুল্লাহর (সা.) কুরাইশদের কথা বলা হচ্ছে, তাহলে তার উচিত আয়াতটি ভালো করে লক্ষ্য করা -- এটাই হল কাফিরদের জন্য প্রতিদান। আমেরিকা যে সক্রিয়ভাবে ইসলামের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হচ্ছে তা নয়, বরং সে ইসলামকে চিরতরে মুছে দিতে চায় -- তাই আমেরিকান সৈনিকদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করার ব্যাপারে ইসলামের কোনো বাধা নেই আর এ ব্যাপারে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয় ।

মেজর নিদাল হাসান যা করেছে সেটাকে ভুল প্রমাণ করার কোনো রাস্তা নেই, কুরআন বা সুন্নাহ থেকে এমন কোনো যুক্তি দেখানো যাবে না যা দিয়ে প্রমাণ হয় নিদাল হাসান ইসলামবিরোধি কোনো কাজ করেছে। ইসলাম তার কাজের শুধু অনুমোদনই দেয় না, বরং ইসলাম এই ধরণের কাজের আদেশ করে যেন মুসলিম জুলুম এবং শয়তানের অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে।

ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, কিন্তু যারা এই শান্তির শত্রু, ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড কঠোর। আপনি শান্তি ভালোবাসেন অথচ যারা শান্তি বিনষ্ট করতে চায় তাদের ঘৃণা করেন না -- এটা কী করে হয়? যে মুসলিমরা আজকে আমেরিকার চোখে 'সন্ত্রাসী' মেজর নিদাল হাসানের নিন্দা করছে আর তার হয়ে নমঃ নমঃ হয়ে ক্ষমা চাইছে, তাদেরকে কুরআনের একটি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিতে চাই,

"যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর।" (সূরা নিসা, ৪: ১৩৯)

তারা বলে ইমাম আনওয়ার সহিংসতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন ...

যে মুসলিমরা সত্যিকারের ইসলামকে আকঁড়ে ধরে, তাদেরকে কি পশ্চিমারা সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেয় না? ইতিহাস সাক্ষী -- যে বা যারা আল্লাহ ও তাঁর নবীদের অবিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদেরকে সন্ত্রাসী তকমা দেওয়া হয়েছে। ফিরআউন মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহকেও (সা.) কি সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করা হয় নি? তাঁর শত্রুরা বলতো, 'মুহাম্মাদ পরিবারের মাঝে বিভেদ তৈরি করছে, সে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করছে।' কুরআন থেকে আমরা জানি, যারা মু'মিন তাদের নিয়ে কাফিররা সবসময় ঠাট্টা-তামাশা করেছে এবং তারা এটা সবসময় করবে।

'সহিংসতা'র প্রশ্নে বলতে হয়, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।" (সূরা আনফাল, ৮: ৬০)

আমাদেরকে সবসময় সামরিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং শত্রুর বুকে "ত্রাস" এর সঞ্চার করতে হবে। পশ্চিমা মিডিয়ার ক্রমাগত প্রপাগান্ডার কারণে আজ মানুষ সন্ত্রাসী বলতেই মনে করে যে নিরীহ মানুষ হত্যা করে। এর মানে এই নয় আমরা আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করে কাফিরদের মনে ত্রাস সঞ্চার করা থেকে বিরত থাকবো।

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, ইসলাম নিরীহ মানুষ হত্যা সমর্থন করে না, তা যুদ্ধাবস্তাহয় হোক বা সাধারন অবস্থায় হোক। তবে "নিরীহ মানুষ" এর সংজ্ঞা কী তা ইসলাম থেকেই আমাদের নিতে হবে, পশ্চিমা মিডিয়া থেকে নয়। আমেরিকার চোখে তাদের সৈনিকরা "নিরীহ" হলেও ইসলামের চোখে তারা অপরাধী। তথাকথিত মুসলিম সেনাবাহিনি যারা আজকে পশ্চিমা স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, শত্রুর চোখে তারা নিরীহ হলেও শরীয়াহর বিচারে তারা মোটেও নিরীহ নয়। কাউকে নিরীহ বললেই সে নিরীহ হয়ে যায় না। যদি তাই হত, তাহলে আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন পাঁচশো মুনাফিক্বকে হত্যা করছিলেন, তখন সাহাবীদের কেউই বলে ওঠেননি, "তাদের মধ্যে তো সবাই অপরাধী না, কেউ কেউ তো নিরীহ লোক আছে।" এ প্রসঙ্গে কুরআনে একটি আয়াত আছে,

"আর (আমি চাইলাম) যমীনে তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফিরআউন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে তা দেখিয়ে দিতে, যা তারা তাদের কাছ থেকে (বনী ইসরাঈল) আশঙ্কা করছিল।" (সূরা নামল, ২৮: ৬)

এই আয়াতটি বলছে ফিরআউন ও তার সৈনিকদেরকে একইসাথে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহর (সা.) সীরাহ থেকে দেখা যায় তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে যুদ্ধ-বিগ্রহে। আমাদের ভালোর জন্যই আল্লাহ তাআলা এমনটা করেছেন। যেহেতু এই উম্মত চারদিক থেকে আক্রমণের শিকার হবে, তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চেয়েছেন আমরা যেন রাসূলুল্লাহর

(সা.) কাছ থেকে শিখি কীভাবে এই কঠিন সময় মোকাবেলা করতে হবে। সাওম নিয়ে কুরআনে দুটো আয়াত আছে আর সবাই সেগুলো জানে, অথচ জিহাদের উপর কুরআনে আয়াত আছে একশোর উপরে কিন্তু অল্প মুসলিমই সেসব আয়াত সম্পর্কে জানে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা, ২: ২১৬)

আমরা হয়তো যুদ্ধকে অপছন্দ করি, শুধু দাওয়াতের মাধ্যমেই যদি সবকিছু সমাহা করে ফেলা যেত আমরা সেটাই খুব পছন্দ করতাম, কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন কোনটি আমাদের জন্য ভালো আর কোনটি খারাপ।

ইমাম আনওয়ার ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে বিশ্বাস করেন, তিনি সত্যিকারের ইসলামের পুনর্জাগরণে বিশ্বাস করেন -- এটা কি ইসলামের মৌলিক কোনো নীতির বিরুদ্ধে যায়। ইমাম আনওয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা যদি করতেই হয়, আমি আমন্ত্রণ জানাই, কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই তা করা হোক।

'কিন্তু আমি চাই না এসব ঝামেলায় জড়াতে...'

অনেক মুসলিম এটা বিশ্বাস করে শত্রুদের সাথে জিহাদ করা আবশ্যক, কিন্তু তারা এই যুদ্ধে নিজেরা জড়াতে চায় না এবং নিরপেক্ষ দর্শকের আসনে আসীন হয়। তারা মনে করে, 'যদি আমরা কোনোপক্ষ অবলম্বন না করি, তাহলে কেউ আমাদের সমালোচনা করতে পারবে না।' তারা মনে করে যেহেতু জিহাদের প্রতি সমর্থনকেও পশ্চিমারা খুব নেতিবাচক চোখে দেখে, এসব থেকে তাই দূরেই থাকা উচিত।

তাদের উচিত কুরআনে সামূদ জাতির কথা স্মরণ করা, কী হয়েছিল তাদের? নবী সালেহকে (আ.) পাঠানো হয়েছিল তাদের কাছে, তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ব্যাপারটা এমন নয় যে শহরের সব জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল, মূলত নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের নেতারা।

"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দাররা ঈমানদার দারিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করলঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর যে সালেহ কে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বললো, নিশ্চয় সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকরা বললো, তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী।" (সূরা আল-আরাফ, ৭: ৭৫-৭৬)

নবী যখন তাদের অনেক করে বোঝালেন, তারা দাবি করবো যেন তাদের একটি নিদর্শন দেখানো হোক যেন তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনতে পারে। তারা তাচ্ছিল্যের সুরে বললো, 'ঠিক আছে, ঐ পাথর থেকে একটা উট বের করে দেখাও দেখি!' তাদেরকে ঠিক তা-ই করে দেখানো হল, আল্লাহ যখন পাথরের বুক চিরে একটি উট বের করে এনে দেখালেন, তারা অস্বীকার করে বসলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে আদেশ করলেন তারা যেন উটনীটিকে হত্যা না করে, কিন্তু তারা তা-ই করলো। কিন্তু কয়জন এই হত্যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল? মাত্র অল্প কিছু মানুষই এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছিল, বাকিরা এই বিষয়ে জানতো, কিন্তু তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলো, কোনো প্রতিবাদ করলো না।

"অতঃপর তারা উষ্ট্রীকে যবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল। আর তারা বলল, 'হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।" (সূরা আল-আরাফ, ৭: ৭৭)

এই ঘটনার ফল কী হয়েছিল? আল্লাহ তাআলা জানাচ্ছেন,

"আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাপিষ্ঠদের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ

গৃহসমূহে উপুর হয়ে পড়ে রইল। যেন তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। জেনে রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে।" (সূরা হূদ, ১১: ৬৭-৬৮)

পুরো শহরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে! শুধু তারাই বেঁচে যায় যারা ছিল সালিহ আলাইহিসসালামের অনুসারী। এই ঘটনায় আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল, আল্লাহ পুরো শহরকে ধ্বংস করে দেন মুষ্টিমেয় কিছু নেতাগোছের লোকের অপরাধে। বাকিরা এই হত্যাকাণ্ডে অংশ নেয় নি, কিন্তু তারা 'নিরপেক্ষ' দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল কারণ তারা তাদের নেতাদের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করে নি, তারা নবীরও অনুসরণ করেনি।

আমাদের এমনটা ভাবা ঠিক নয় যে আমাদের নেতাদের কাজের জন্য আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্নীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ তাদের শুভাকাঙ্খী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপুর কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত।" (সূরা নিসা, ৪: ১৩৫)

কাজেই 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করলে আমরা মুক্তি পাবো না। আমরা যদি নিজেদের মুসলিম হিসেবে আসলেই বিশ্বাস করি, তাহলে আমাদের উচিত আল্লাহর আদেশ নিয়ে কোনো প্রশ্ন না তোলা এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর আদেশ পালন করা। যদি এজন্য কাফিররা আমাদের গায়ে

‘সন্ত্রাসী’ তকমা দেয়, তাতেও আমাদের ভয় পাওয়া চলবে না। আর আমরা যদি তা না করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের সাবধান করছেন,

“হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।” (সূরা মায়িদা, ৫: ৫৪)

যদি আমরা নিজেদের দায়িত্ব পালন না করি, আল্লাহ এমন মানুষদের দ্বারা আমাদের প্রতিস্থাপন করবেন যারা আমাদের চেয়ে উত্তম। তারা ‘তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না।’ তাদের বৈশিষ্ট্য হল তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কাজেই, আমাদের প্রতিস্থাপিত হয়ে যাবার আগেই আমাদের উচিত সেই গুণগুলো ধারণ করা যেগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন। কাফিরদের প্রতি অতি মাত্রায় সমবেদনা জানানোর কিছু নেই এবং মুসলিমদের অতিরিক্ত সমালোচনাও বন্ধ করা উচিত।

কাজেই, আপনি এরপর থেকে যখনই শুনবেন, কোনো আলিমের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ তোলা হচ্ছে, সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তখন নিজেকেই প্রশ্ন করুন, ‘এই কাফিরদের কথা আমি কেন বিশ্বাস করছি?’

আমি বলছি না, ইমাম আনওয়ার যা বলেছেন সব ঠিকই বলেছেন, আল্লাহই ভালো জানেন। আমার মূল বক্তব্য এতটুকুই, যদি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তিনি ঠিক হন, আমরা তার বিরুদ্ধে কথা বলতে পারি না এবং কাফিরদের সাথে এক সুরে তার নিন্দা করতে পারি না। তার পক্ষে উঠে দাঁড়ানো এবং তার সম্মান রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। তবে আমি কোনো ব্যক্তির পক্ষ নয়, আদর্শের পক্ষ নিচ্ছি। এটা হল সেই আদর্শ যা ইসলামকে সত্যিকারের ইসলাম হিসেবে মেনে

চলার প্রেরণা যোগায়, কোনো কাঁটাছেড়াকে বরদাশত করে না। এই আদর্শ আল্লাহর হুকুমে কোনো মানবীয় হস্তক্ষেপকে মেনে নেয় না। ইমাম আনওয়ারকে শুধু এই কারণেই মিডিয়াতে টার্গেট করা হয়েছে কারণ তিনি কিছু সত্য কথা বলেছেন যা তারা অপছন্দ করে। আর পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তিনি ঘৃণা ছড়াতেন -- এ অভিযোগের ব্যাপারে বলতে রাসূলুল্লাহর (সা.) একটি হাদীস।

রাসূল(স) বলেছেন, “ঈমানের সবচেয়ে শক্ত রজ্জু হলো আল্লাহর জন্যে ভালবাসা এবং তাঁরই জন্যে ঘৃনা করা” (বুখারি)

কাজেই ব্যাপারটা এমন নয় যে আমরা শুধু ভালোকাজকারীদের ভালোবেসে যাবো, বরং যাদের আল্লাহ ঘৃণা করেন আমরাও তাদের ঘৃণা করবো। ইসলামের শত্রুদেরকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা সত্যিকারের ঈমানের চিহ্ন।

পরিশেষে বলতে চাই,

- ইমান আনওয়ারের লেকচারগুলোর মূলভিত্তি হল কুরআন ও হাদীস।
- আমেরিকা তাকে সন্ত্রাসী তকমা দিয়েছে কারণ তিনি জিহাদের বিষয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে দ্বিধা করেন না। তিনি যেসব মত দিয়েছেন, কুরআন ও সুন্নাহয় সেগুলোর ভিত্তি আছে।
- নিদাল হাসান যা করেছে, তা শরীয়াহ সমর্থিত। যারা আল্লাহর পথের শত্রু, তাদেরকে সাথে ‘শান্তিপূর্ণ’ হতে ইসলাম আমাদের আদেশ দেয় না, যতক্ষণ না তারা শান্তির পথে ফিরে আসে। নিদাল হাসান কোনো বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করেননি, তিনি আমেরিকান সৈনিকদের হত্যা করেছেন যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত।
- আমরা এখন যুদ্ধাবস্থায় আছি। এই ব্যাপারে যদি আপনি একমত না হন, সেক্ষেত্রে বিষয়টি পড়াশোনার দাবি রাখে। আপনি তাদের সাথে আলোচনা করতে পারেন যারা হক্ব কথা বলেন এবং হক্বের পথে চলেন। আর যদি এমন কাউকে না পান সেক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে অন্তত দুআ করুন যেন তিনি আপনার সামনে সত্যকে উন্মোচিত করে দেন।

- নীরব থাকলে কিয়ামতের দিনে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ থেকে বেঁচে যাবো -- এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আমাদেরকে একটি পক্ষ নিতে হবে এবং সেই পক্ষে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। হয় আমরা সঠিক পথে থাকবো, না হয় ভুল পথে, সত্য আর ভুলের মাঝে মাঝামাঝি অবস্থান বলে কিছু নেই।

- আমাদের বর্তমান সময়ে ইসলামী ইতিহাস নিয়ে বিশদ পড়াশোনা করা কিছুটা কষ্টসাধ্য বটে। এক্ষেত্রে ইমাম আনওয়ারের লেকচারগুলো আপনাকে সাহায্য করতে পারে। মোটামুটি অল্প পরিশ্রমে তার লেকচার থেকে এই ব্যাপারে অনেক কিছু জানার সুযোগ আছে। যেসব মুসলিম ভাই-বোন এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে চান আমি তাদেরকে তার লেকচারগুলো শোনার আমন্ত্রণ জানাবো।